Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume – I, Issue-II, published on April 2021, Page No. 40 –45
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় সমাজ চেতনা

রামকিশোর বর্মণ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সহকারী অধ্যাপক
শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়, ডালখোলা
ইমেইল- ramsam1981@gmail.com

Keyword
বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতা, চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক, সমাজ বাস্তবতা বোধ।

Abstract
বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বুদ্ধদেব বসু। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। ১৯২৫ সালে 'মর্মবাণী' প্রকাশ করেন। 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিক কবিতার যুগে প্রবেশ করেন। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো তিনি রবীন্দ্র কাব্যাদর্শ থেকে সরে আসেন। কল্লোলের কোলাহলে তিনিও সরব এবং স্বপ্রতিভ। তাঁর কবিতায় চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে দেশভাগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে।

Discussion
বাংলা আধুনিক কবিতার ভাবনায় এবং চেতনায় এক ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। তিনি বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম পথ প্রদর্শক। তিনি ১৯২৫ সালে 'মর্মবাণী' প্রকাশ করেন। এরপর 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'একটি কথা' (১৯৩২), 'পৃথিবীর পথে' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দয়মন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'যে আঁধার আলোর অধিক' (১৯৫৮), 'মরচে পড়া পেরেকের গান' (১৯৬৬), 'একদিন চিরদিন' (১৯৭১) এবং 'স্বাগত বিদায়' (১৯৭১)। আধুনিক কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বন্দনা দিয়ে কবিতা রচনা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে হওয়ার জন্য যিনি সুতীব্র এক নতুন কাব্য আন্দোলন শুরু করছিলেন তিনি। ১৩৩১ (১৯২৫ খ্রি.) বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'মর্মবাণী' কাব্য প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ হয়ে গেছে। কল্লোল যুগে যে নব্য কাব্য আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে অন্যান্য আধুনিক কবিদের মত তীব্র রবীন্দ্র বিরোধীতায় মত্ত হয়েছিলেন তিনি। অপর দিকে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র ভাবাদর্শকে স্বীকারও করেছিলেন। তিরিশের দশকে জীবনানন্দ

দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমূখ কবিগোষ্ঠী নিজস্ব কাব্য ধ্যান-ধারণা থেকেই রবীন্দ্র কাব্য চেতনাকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট এবং স্ফল হয়েছিলেন। এই সময়ে বাংলা কাব্যের জগতে ডি. এইচ. লরেন্স, ডব্লু. বি.ইয়েটস্, হুটম্যান, এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিয়ট প্রমুখের চেতনা এবং মতাদর্শ প্রবিষ্ট হয়। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী চল্লিশের দশকে নির্ণয় করেছেন ১৯৩৭-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় মানব প্রেমের অন্তর্বোধকে উদ্ঘাটন করেছিলেন। তিনি মূলত প্রেমের কবি।

বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'য় তার কাব্যাদর্শ পাঠকদের নতিন করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যের কাব্য, উপন্যাস এবং নাটকে পরিবর্তনের প্রবল প্রবাহ শুরু হয়েছিল যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক ভাঙ্গা-গড়ার যুগ— উত্তাল হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। সেই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে বসে বুদ্ধদেব বসু দেহবাদী প্রেমের রূপকে নির্মমভাবে উন্মোচন করলেন।

> "যে নির্লজ্জ ভোগ-কামনা-লালসা-যৌনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তা থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশে অনন্ত নীলাকাশের দিকে হাত বাড়াবার কথ বল্ললেন।"[১]

ফ্রয়েড-ইয়ং-হ্যাংলক-এশিস প্রমুখ পাশ্বাত্য চিন্তাবিদদের প্রভাব পড়েছিল সেদিনকার বাংলা সাহিত্যে। একটি বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ— এই দুর্জ্ঞেয় সময়ের ভাবনা বাংলা কাব্যের জগৎকে প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিংশ শতকের তিরিশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য যাত্রা শুরু হয় এবং শেষ হয় ষাটের দশকে – এই দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তিনি কাব্য সাধনা করে গেছেন। কাব্য সাহিত্য ছাড়াও তিনি নাটক, উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে সাবলীলতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ারের ভাবাদর্শ তাঁর কাব্যে প্রতিনিয়ত স্পষ্ট স্ফুরণ ঘটেছে। সাহিত্যের কাল বিভাগ যদি দশক ধরে বিচার-বিবেচনা করা হয়, তাহলে বুদ্ধদেব বসুর তিরিশের দশকের কবি; কিন্তু তিনি চল্লিশ-পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকেও নিরলস কাব্য সাধনা সাধনা করে গেছেন। বিংশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক হল ঔপনেবেশিক শাসন মুক্ত হওয়ার দশক। ভারতসহ বিশ্বের বহুদেশে গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। পরাধীতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে নতুন স্বপন দেখার এবং ভাববার অবকাশ পেয়েছিল। 'বাংলা কবিতার চল্লিশের দশক যতটা বাস্তব ইতিহাসের আলোড়নকে ধারণ করেছে তেমন বোধ হয় অন্য কোনো সময়ে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভুবন থেকে প্রথম সচেতন ভাবে সরে এসেছিলেন যে কবিরা সেই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ প্রেক্ষাপটগত পরিবর্তনের নির্যাস পান করেছিলেন বলেই হতে পেরেছিলেন আলাদা'।[২]

এই সময়ে বাংলা কাব্যের জগতে ডি. এইচ. লরেন্স, ডব্লু. বি.ইয়েটস্, হুটম্যান, এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিয়ট প্রমুখের চেতনা এবং মতাদর্শ প্রবিষ্ট হয়। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী চল্লিশের দশকে নির্ণয় করেছেন ১৯৩৭-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় মানব প্রেমের অন্তর্বোধকে উদ্ঘাটন করেছিলেন। তিনি মূলত প্রেমের কবি। 'বন্দীর বন্দনা'য় (১৯৩০) যন্ত্রণাদগ্ধ এক নির্মম প্রেমের বন্দনা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্র প্রেম চেতনা থেকে যাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রেম দেহকেন্দ্রিক কবির কল্পনা আশ্রিত কোনো নারী নয়— বাস্তব জগতের রক্ত-মাংসের জীবন্ত কোনো নারী। তিরিশের দশকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় প্রেমের অন্য রূপ প্রদান করলেন। 'বন্দীর বন্দনা'য় ছিল তার প্রেমের ঘোষণা, 'কঙ্কাবতী'তে সম্ভাষণ প্রত্যক্ষের আলোয় উচ্চারিত হল অতঃপর স্বগত সংলাপ। 'দয়মন্তী' যখন লেখা হল তখন তিনি পৌঁছে গেছেন তাঁর রোহভূমিতে'।[৩] মহাসমর চলাকালীন ন্যায়-নীতিহীন মানুষের ভীড়, ক্রমশ বেড়ে চলেছে মনুষ্যত্ববোধ, বিবেকহীন মানুষ— অন্ধকারের প্রতীক্ষায় জেগে আছে। সমাজ পরিকাঠামো ক্ষত-বিক্ষত। মানুষ তো মানুষের জন্য, তবে কেন আজ মানুষের এই ভয়াল রূপ কোলকাতার রাজপথে। বিভৎস রূপ আরও স্পষ্ট —

আগে তাঁর একাধিক কাব্য প্রকাশিত হলেও চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর 'নতুন পাতা' (১৯৪০), 'একটি পয়সার একটি' (১৯৪২), '২২ শে শ্রাবণ' (১৯৪২), 'দয়মন্তী' (১৯৪৩), 'রূপান্তর' (১৯৪৪), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা' এবং 'বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'যে আঁধার আলোর অধিক' (১৯৫৮০) প্রভৃতি কাব্য। ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়— 'মরচে পড়া', পেরেকের গান, 'একদিন : চিরদিন', তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'স্বাগত বিদায়', 'সংক্রান্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'কালিদাসের মেঘদূত', 'শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা', 'হেল্ডোর্লির কবিতা', 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা', 'বারো মাসের ছড়া' প্রভৃতি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পরাধীন ভারতবর্ষের এর প্রবল প্রভাব পড়ে। ইতালির মুসোলিনি এবং জার্মানির হিটলারের হাত ধরে ফ্যাসিবাদ তীব্র আকার ধারণ করে। এই মহাসংকটের দুর্দিনে অসহায় মানুষ আতঙ্ক এবং দুশ্চিন্তায় প্রতি নিয়ত প্রহর গুণতে থাকে। কলকাতাসহ গোটা দেশে বিদেশী বোমারু বিমানের আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ধ্বংসলীলার পূর্বাভাষ, মহাত্মা গান্ধির বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ— এরই মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি। এই সময় নেতাজির আজাদ-হিন্দ-ফৌজের পরাজয়। বোম্বেতে নৌ-বিদ্রোহ, প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন এবং সাতচল্লিশে ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ। মোটকথা এই সময় ছিল ভাঙ্গা-গড়ার যুগ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ। বাংলার অতুল ঘোষ এবং বিধানচন্দ্র রায়ের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনগণের আশা-প্রত্যাশা পূরণে তাঁরা ব্যর্থ। এইসব ঘটনাবলী বুদ্ধদেব বসুকে ষাটের দশক নতুন করে ভাববার পটভূমিকা রচনা করে।

চল্লিশের দশকে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪) হয়। 'যে কবিরা প্রথম লিখতে শুরু করেছিলেন এবং কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য রেখেছিলেন মধ্য ত্রিশ থেকে মধ্য চল্লিশের দশকের অন্তর্গত সময়ে তাঁদেরই চল্লিশের কবি বলছি আমরা'।[৪] এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসুকে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশের কবি বলতে কোনো দ্বিধা নেই। মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং জাতীয় জীবনে যে সংকট; সেই সংকটের প্রভাব বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রকট।

"...যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ কবিতার প্রেরণা হতে পারে না, এমনকি নিজেরা প্রেরণা হতে পারে?"[৫]

কবির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ-এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটেছে চল্লিশের দশকের কবিতাগুলিতে। কবির অন্তর্মুখীনতা যতটা প্রকট, ততটা বাহ্যিক আড়ম্বরতা নেই। রাজনীতি এবং সমাজবোধ যতটা অন্যান্য কবিদের মত থাকার দরকার ছিল, ততটা হয়তো নেই। তবুও তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতায় সমকালীন রাজনৈতিক তথা সামাজিক মূল্যবোধ প্রবল। 'কঙ্কাবতী' যখন প্রকাশিত হয়, ততদিনে মহাসমরের ঘন্টা বেজে গেছে। চারিদিকে সর্পিল সময়ের হাতছানি। 'সময়কে ছাড়িয়ে যেতে হবে'। 'একটি পয়সার একটি' কাব্যে'র কবিতায় ভাবালু আত্ম করুণায় মগ্ন কবিচিত্র শিল্পী যামিনী রায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন —

'আমাদের পাপে নিজের জীবনে জীর্ণ
করলে যামিনী রায়।
জীবনের রসে শিল্পরে দিলে প্রাণ
জ্বাললে জীবন শিল্পের শিখা থেকে'।

বুদ্ধদেব বসু যামিনী রায়ের শিল্পী মনকে যথোচিত মূল্য দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত 'কালের পুতুল' গ্রন্থে প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছিলেন যামিনী রায়। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় দ্বিতীয় মহাসমরে সভ্যতার শ্মশান শয্যায় সংক্রমিত মানুষের মর্মে এবং মজ্জায়। 'সভ্যতার সংকট'-এ দীর্ণ বুদ্ধদেব বসুর কবিগুরুকে স্মরণ করা ছাড়া বোধ হয় আর কোনো উপায় ছিল না।

'তোমারে স্মরণ করি আজ এই দুর্দিনে
হে বন্ধু, পে প্রিয়তম'।

মহামারী, মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, বিপন্ন বিশ্ব, ন্যায়-নীতি ভ্রষ্ট মানব সভ্যতা। কবিগুরুকে স্মরণ করে জানিয়ে দেন— তিনি আশাবাদী।

'তোমার অক্ষর মন্ত্র, অন্তরে বলিতেছি তোমার বাণী
তাই তো মানি ভয়, জীবনের জয় হবে জানি'।

> "বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী রূপকে কবি পংক্তিতে পং,ক্তিতে চিত্রায়িত করেছেন। যে প্রাণের অস্তিত্বকে, জীবনকে সজীব করে তোলে, যে সুন্দরের অবস্থান জগৎকে মাধুর্য এনে দেয়, তাকে বিদ্ধ করার জন্যই মৃত্যু মুখে সঙিন উদ্যত হয়েগীন।"[৬]

'এক পয়সার একটি' কবিতায় কবি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দীপ্ত তেজস্বী তরুণের যৌবন— তার ক্লিষ্ট জীবন ও জীবিকার তাগিদে সে হাতুড়ি ধরেছে।

'দয়মন্তী' কাব্যের 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা', 'সাগরদোলায়', 'বিরহী', প্রভৃতি কবিতার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের করাল ছায়া প্রবিষ্ট হয়েছে। প্রেম হয়েছে দীর্ণ, ক্লিন্ন। এলিয়টের 'The West Land' -এর মতো চল্লিশের দশকের দিনগুলো সভ্যতার নগ্নরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। যেখানে জল নেই, বায়ু নেই, সেখানে জীবনের উচ্ছলতা নেই। তাঁর 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতারই প্রতিধ্বনি।

> "ইতালি আফ্রিকার আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করলে রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'আফ্রিকা' কবিতা রচনা করেন। সাত বছর পরে ১৯৪৪ সালে 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' কবিতাটি রচনা করে বুদ্ধদেব বসুর ধিক্কার শুধু শানিত ব্যঙ্গেই সমাপ্ত হয়নি, তিনি শোষণ ও অপমান জর্জরিত আফ্রিকার এক মহৎ বৈপ্লবিক সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ 'আফ্রিকা' কবিতার বাহ্যিক রূপ অঙ্কন করেছিলেন। বুদ্ধদেব আবিস্কার করলের তার শীর্ণ, দীর্ণ, ক্লিষ্ট, ধর্ষিত রূপ। দুর্বলকে সবলের আঘাত — একজন চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে খুবই অসহনীয়। প্রতিপদে যা যন্ত্রণাময় করে তোলে। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারত ১৫ অগাস্টে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেল। কিন্তু সে স্বাধীনতা খণ্ডিত, অপ্রত্যাশিত, হতাশা এবং যন্ত্রণার। জীবনানন্দ দাশ '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দেশভাগের যে যন্ত্রণাকাতর, নির্মম চিত্র তুলে ধরেছিলেন, সেই বিভৎস দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অখণ্ড বাংলা আজ আর নেই। ধর্মীয় সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভর করে আজ বিভাজিত সীমানার এপার এবং ওপার দুই বাংলা। যার পরিণামে তৎকালীন ঢাকা, কোলকাতার ওলি-গলি-রাজপথে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের রূপ ধারণ করেছিল তা ছিল খুবই মর্মান্তিক এবং পাশবিক। সময়ের অভিঘাতে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার চেতনা হয় যন্ত্রণাদগ্ধ। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সত্তার উপর এ এক চরম আঘাত। 'উদ্বাবস্তু' কবিতায় সে কথাই ব্যক্ত করেছেন কবি। কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত চোদ্দ পুরুষের স্বভূমি থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু মানুষের জীবন যন্ত্রাণাকে। সতীকান্তের মতো এক তরুণের চোখে এ এক বিপন্ন বিস্ময়।

'রসুইপুরের সতের সালের দুর্গা পূজার গল্প
খাঁটি কুমিল্লা জেলার ভাষায়
একটি শ্যামল রঙের পাৎলা গোঁফওলা যুবক
বসে থাকে পাথরের বেঞ্চিতে জলের ধারে'।

অথবা
'যেখানে হিন্দুস্তান পার্কের আকস্মিক আরম্ভ কিংবা শেষ
যেখানে ফুটপাতের উপর
শুয়ে আছে একজন— বলতেই হয় মানুষ একজন স্ত্রীলোক,
যেহেতু অন্য কোনো নাম জানা নেই'।

কবি 'চিলতে', ময়লা চুল', 'কাদার মত হাতের' ও মুখের রঙের স্ত্রীলোকের কোলে ঘুমন্ত ছোটো বাচ্চা। উদ্‌বাস্তু মানষগুলোর মুখ বিবর্ণ, নারকেলের ছিবড়ের মতো চুল, বিস্ফারিত চোখ, নেই কষ্ট, প্রার্থনা, প্রতিবাদ। কেউ সন্তানের মা, কেউ মানুষ, অথবা মানুষের স্ত্রী।

ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় অনুপ্রবেশকারী ঔপনিবেশিক বণিক শ্রেণীকে ধিক্কার জানিয়েছেন কবি —

"আলো আনো বাণিজ্যের যার জেরে
দ্রুত তব অঙ্কতলে
পূর্ণ হোক কাল।
স্থূলোদর লোল জিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ হোক;
পূর্ণ করোঁতবিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক, বিকৃত জাতক
তার জয়ধ্বনি করো।"

'সাগর দেশে' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিকা সুরঙ্গমাকে উদ্দেশ্য করে পুরোনো স্মৃতির কথা রোমন্থন করেছেন। প্রেমিক কবি তাঁর প্রিয়তমার কাছে জানতে চেয়েছেন —

"কত কালো রাতে করাতের মত চিরে
ভাঙ্গাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে
ভাঙ্গন এনে..."।

মহাসমর চলাকালীন ন্যায়-নীতিহীন মানুষের ভীড়, ক্রমশ বেড়ে চলেছে মনুষ্যত্ববোধ, বিবেকহীন মানুষ — অন্ধকারের প্রতীক্ষায় জেগে আছে। সমাজ পরিকাঠামো ক্ষত-বিক্ষত। মানুষ মানুষের জন্য, তবে কেন আজ মানুষের এই ভয়াল রূপ কোলকাতার রাজপথে। বিভৎস রূপ আরও স্পষ্ট —

'আকাশের অসীম চাঁদ কোলকাতারয় শুধু বাদ সাধে
কুখ্যাত পাখির ঘুমে কর্কশ চিৎকার দিয়ে ডাক
ফুটপাতের গাছের বিছানা ছেড়ে উড়ে যায়;
সতীকান্ত মুগ্ধ হয়ে দেখল— হ্যাঁ এও একরকম মুগ্ধতা
অমন ঘোলাটে চোখে কখনো কোনো মানুষের মুখে সে দ্যাখে নি।
তারমনে পড়ে গেলো দান্তের ইনফার্মো
সেইখানে দুই ছেলেকে নিয়ে বন্দী বাপ অনশনে মরছে'।

পৃথিবী তখন বেদনায় মোচড় খাচ্ছে, আধুনিক অস্তিত্বের জটিলতা তখন আর বুদ্ধদেবের মতো আত্মলীনের কাছে অপাংক্তেয় থাকলো না। 'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ১৯৪০', কোনো কবি বন্ধুর প্রতি', 'চলচ্চিত্র', 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' — এইসব কবিতা শিখলেন না। আপাত দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব বসুকে প্রেমের কবি, দেহবাদী বিশুদ্ধবাদী কবি যাই বলা হোক না কেন — 'চল্লিশ ও পঞ্চাশের সমকালীন কবিতাগুলিতেই তার ছাপ স্পষ্ট। দেশ-কালকে অস্বীকার করার কারো সাধ্য নেই। বুদ্ধদেব বসুও তার ব্যতিক্রম নন।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, শীতল, 'আধুনিক বাংলা কবিতা নিবিড় পাঠ' প্রজ্ঞাবিকাশ ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কোলকাতা - ৯, পুণমুদ্রন, জুলাই ২০১২-১৩, পৃ. ১০৩
২. দাশগুপ্ত, আলোক রঞ্জন এবং বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পা), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭৩, প্রথম দেজ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২৮
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭৩ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ- অক্টোবর ২০০০, পৃ. ২০১
৪. ঐ
৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল', জে. এন. সিংহ রায় নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কোলকাতা - ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৪২
৭. ঘোষ, গৈরিকা, 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতার উৎস ও বিবর্তন', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটলা লেন, কোলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮০

গ্রন্থপঞ্জি :

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা,' নরেশ গুহ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা - ৭৩, একাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০২
'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়', অশ্রুকুমার শিকদার, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা - ৬, সপ্তম মুদ্রন, বৈশাখ ১৪১১